#আমি পদ্মজা পর্ব ১৪

_____
চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। সঙ্গে হুইসেলের শব্দ। গভীর রাতের ট্রেন ছুটে চলেছে গন্তব্যের দিকে। আরেকটা আওয়াজও আসছে। কাছে কোথাও নেড়ি কুকুরের দল ঘেউঘেউ করছে। পদ্মজা ইংরেজি বইয়ের দিকে চোখ রেখে মিনমিনে স্বরে বলল,'পরীক্ষা তো কালদিন পর।'
হেমলতা খোলা চুল মুঠোয় নিয়ে হাত খোঁপা করেন। এরপর বললেন,'কাল আর কালদিন পর একই হলো।'

পদ্মজা চুপ হয়ে গেল। এমন ভান ধরল যেন সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। হেমলতা চোখ ছোট করে পদ্মজাকে দেখছেন। মেয়েটা পড়ায় মনোযোগ দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু সফল হতে পারছে না। বার বার নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে টিপছে।

‘পদ্ম, ছাদে যাবি?’
হেমলতার এহেন প্রস্তাবে পদ্মজা একটু অবাক হলো। নাকের পাটা হয়ে গেল লাল। এতে নাক লাল হওয়ার কী আছে জানা নেই। পদ্মজা কিঞ্চিৎ হা হয়ে তাকিয়ে রইল। হেমলতা আবার বলেন,’যাবি?’

পদ্মজা টেবিল থেকে প্রফুল্লচিত্তে ছুটে এলো। বলল,'যাব।'

আকবর হোসেনের বাড়িটির নাম সিংহাসনকুঞ্জ। বাড়ির নাম এমনটা হওয়ার কারণ ছাদে না গেলে জানা সম্ভব নয়। মা-মেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দিকে উঠছে। তাদের পায়ের শব্দ মোহময় ছন্দ তুলে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। অথবা মিলে যাচ্ছে চাঁদের আলোর সাথে একাকার হয়ে। ছাদের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সিংহাসন। তা দেখে পদ্মজার চক্ষু চড়কগাছ। বিষ্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল,'আম্মা! এত বড় সিংহাসন কার?'

হেমলতা পদ্মজার মুখের ভাব দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। তিনি দুইদিন আগে এই সিংহাসন আবিষ্কার করেছেন। আকবর হোসেনের কাছে প্রশ্ন করেছেন, ঠিক পদ্মজার মতো করেই। আকবর হোসেনের উত্তর হেমলতা পুনরাবৃত্তি করলেন,' তোর আকবর কাকার আব্বু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের। উনার ইচ্ছে ছিল,নিজের বাড়ির ছাদে একটা সিংহাসন করার৷ শেষ বয়সে এসে ইচ্ছে পূরণ করেন। দিনরাত নাকি রাজকীয় ভঙ্গীতে সিংহাসনে বসে থাকতেন। মৃত্যুও হয় সিংহাসনে ঘুমানো অবস্থায়।'

পদ্মজা হা অবস্থায় স্থির হয়ে রইল। সে সিংহাসন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ময়ূর সিংহাসন! সিংহাসন যেন পেখম মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ইট-সিমেন্টের তৈরি সিংহাসন। অনেক বড় দেখতে। পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্যের বা আরো বেশি হবে৷ হেমলতা বলেন,'মোঘল সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনের মতো সিংহাসনের স্বপ্ন বোধহয় তিনি দেখতেন। অর্থের জন্য পারেননি।'

হেমলতার কথা পদ্মজা শুনল নাকি বোঝা গেল না। পদ্মজা অনুরোধ করে অন্য কথা বলল, 'আম্মা, সিংহাসনে বসো তুমি।'

এক কথায় হেমলতা সিংহাসনে বসেন। এরপর পদ্মজাকে ডাকেন পাশে এসে বসতে। পদ্মজা আসল না। দূর থেকে বলল, ‘মাঝে বসো আম্মা।’
‘কী শুরু করেছিস।’
‘বসো না।’
হেমলতা কপাল কুঁচকে সিংহাসনের মাঝে বসেন। পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটে আবার হারিয়ে গেল।
বলল,’আরেকটু বাকি।’
‘কি বাকি?’
‘বাম পায়ের উপর ডান পা তুলে রানিদের মতো বসো।’
হেমলতা বিরক্তি নিয়ে উঠে পড়েন। পদ্মজাকে বলেন,’পাগলের প্রলাপ শুরু

করেছিস!’
পদ্মজা নাছোড়বান্দা হয়ে দৃঢ়ভাবে বলল,’আম্মা, বসো না। নইলে আমি কাঁদব।’

পদ্মজার এমন কথায় হেমলতা হাসবেন না রাগবেন ঠাওর করতে পারলেন না। রাতের সৌন্দর্য, রাতের মায়াবী রূপ প্রতিটি মানুষের ভেতরের আহ্লাদ, ইচ্ছে, কষ্ট, ঠেলেঠুলে বের করে আনার ক্ষমতা বোধহয় নিজে আল্লাহ সাক্ষাৎ করে দিয়েছেন। তাই হেমলতা তার নিজের শক্ত খোলসে ফিরতে পারলেন না। পদ্মজার পাগলামোর সুরে সুর মিলিয়ে তিনি

সিংহাসনে রাজকীয় ভঙ্গীতে বসেন। পদ্মজার কেমন কেমন অনুভূতি হয়। বুকের ভেতর ঝিরিঝিরি কাঁপন। এইতো তার কল্পনার রাজ্যের রাজরানি হেমলতা। এবং তার কন্যা সে পদ্মজা। চোখের মণিকোঠায় ভেসে উঠল একটি অসাধারণ দৃশ্য। হেমলতার সর্বাঙ্গে হীরামণি-মুক্তার অলংকার। অসম্ভব সুন্দর শ্যামবর্ণের এই সাহসী নারীকে দেখতে কতশত দেশ থেকে মানুষ ভীড় জমিয়েছে। আর সে হেমলতার পাশে বসে আছে। চারিদিকে ঢাকঢোল পিটানো হচ্ছে। হাতিশাল থেকে হাতির হুংকার আসছে। তারাও যেন খুশি এমন রানি পেয়ে।

‘তোর পাগলামি শেষ হয়েছে?’
পদ্মজা জবাব দিল না। হেমলতার পাশে এসে বসল। কোলে মাথা রেখে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। এরপর আক্ষেপের স্বরে বলল,’আম্মা, তুমি রানি আর আমি রাজকন্যা কেন হলাম না। সবাই আমাদের ভালোবাসত। সম্মান করতো। মুগ্ধ হয়ে দেখতো।’
হেমলতার বুক চিঁরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসল। সমাজ কেন তার প্রতিকূলে থাকল? কেন পদ্মজা ছোট থেকে সমাজের কারোর মেয়ের সাথে মেশার অধিকার পেল না? তিনি বললেন,’জন্ম যেভাবেই হউক। জীবনে সফলতা না

এনে মৃত্যুতে ঢলে পড়া ব্যক্তির ব্যর্থতা। তুই এমন জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা কর যাতে মানুষ সম্মান করে। সম্মান করতে বাধ্য হয়। চোখ তুলে তাকাতেও যেন ভয় করে। যারা দূরছাই করেছে তাদের যেন বিবেকে বাঁধে।’

‘পারব আমি?’

‘কেনো পারবি না? পুরো জীবন তো দুঃখে,অবহেলায় যায় না।’

‘তোমার জীবন থেকে এতোগুলো বছর দুঃখে আর অবহেলায় তো গেছে আম্মা।’

হেমলতা কিছু বলতে পারলেন না। তিনি জীবনে কী পেয়েছেন? উত্তরটা

চট করে পেয়ে গেলেন। পদ্মজাকে বলেন,’আমার মেয়ে তিনটা আমার সফলতা। আমার অহংকার। প্রেমা তো ছোট। তোরা দুইজন নিজেদের মতো থাকিস, পড়িস, কোনো দুর্নাম নাই। এজন্য মানুষ বলে, এইযে এরা হচ্ছে হেমলতার মেয়ে। তখন আমার অনেক কিছু পাওয়া হয়ে যায়।’

পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল,’কখনো ভুল কাজ করব না আম্মা। তোমাদের সম্মান আমাদের জন্য আংশিকও নষ্ট হতে দেব না।’

হেমলতা পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। নিস্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে মাঝে

মাঝে পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাখ-পাখালির ডানা নাড়ার শব্দ ভেসে আসছে। পদ্মজা চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে একটা চাঁদ, অগণিত তারা। আকাশকে তারায় পরিপূর্ণ একটি কালো গালিচার মত লাগছে। হেমলতা বিভ্রম নিয়ে বললেন,'সমাজের সাথে আমার সখ্যতা কখনো হয়ে উঠেনি। কালো রংয়ের দোষে। প্রকৃতির মতিগতি অবস্থা দেখে দেখে আমার সময় কাটে। আব্বা শিক্ষক ছিলেন বলে, কালো হয়েও পড়ার সুযোগ পাই। অবশ্য আব্বার সামর্থ্যও ছিল। আমাদের সব ভাই-বোনকে পড়িয়েছেন। আম্মা আমাকে

পড়ানোতে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। রং কালো। কেউ বিয়ে করবে না। একটু পড়ালেখা থাকলে হয়তো করবে,সেই আশায়। যখন আমি তোর বয়সে ছিলাম বড় আপার মেয়ে হয়। মেয়েটার গায়ের রং কালো। শ্বশুর বাড়িতে তুলকালাম কান্ড। বংশের সবাই ফর্সা। বাচ্চা কেন কালো হলো। আপাকে বের করে দিল। আপা বাপের বাড়ি ফিরল। সমাজের কতো কটুক্তি কথা হজম করেছে আপা। তখন আমি নামাযের দোয়ায় আকুতি করে চাইতাম একটা সুন্দর মেয়ের। আমার বিয়ে হলে,মেয়েটা যেন পরীর মতো সুন্দর হয়। আমার মতো অবহেলার পাত্রী

যেন না হয়। বড় আপার মতো কালো মেয়ে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে যেন না হয়। তুই যখন পেটে,এবাদত বাড়িয়ে দেই। পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাদে সময় পেলেই সেজদায় লুটিয়ে আল্লাহকে একই কথা বলতাম। আমার পরীর মতো মেয়ে চাই। দোয়া কবুল হলো। তোর যেদিন জন্ম হয়, সবাই অবাক হয়ে শুধু তাকিয়েই ছিল। আমি তো খুশিতে কেঁদেই দিয়েছিলাম। এতো সুন্দর বাচ্চা এই গ্রামে কেন, পুরো দেশেও বোধহয় ছিল না। চোখের পাপড়ি যেন ভ্রুতে এসে ঠেকছিল। ঠোঁট এতো লাল ছিল। যেন ঠোঁট বেয়ে রক্ত ঝরছে। সদ্য

জন্মানো শিশুর মাথা ভর্তি ঘন কালো রেশমি চুল।অলন্দপুরের সবার কাছে ছড়িয়ে পরে এই কথা। দল বেঁধে দেখতে আসে। এক সপ্তাহ বেশ তোড়জোড় চলে। কী খুশি ছিলাম আমি। সারাক্ষণ তোকে চুমোতাম। রাতেও ঘুমাতে ইচ্ছে করত না। মনে হতো এই বুঝি আমার পরীর মতো মেয়ে চুরি হয়ে গেল। তোর আব্বা সারাক্ষণ খুশিতে বাকবাকম করতো। বাইরে থেকে এসে গোসল ছাড়া কোলে নিত না। যখন কোলে নিত বার বার আমাকে বলতো, ‘ও লতা। ছেড়িডা মানুষ না শিমুল তুলা।’
হেমলতা থামেন। চোখ তার ছলছল।

পদ্মজা বলল,’তারপর?’
‘কেউ বা কারা ছড়িয়ে দিল তুই তোর বাপের মেয়ে না। যুক্তি দাঁড় করাল। বাপ,মা কালো মেয়ে এতো সুন্দর কেন হবে? গ্রামের প্রায় সব মানুষ অশিক্ষিত। তাই বিবেচনা ছাড়াই বিশ্বাস করে নিল। ‘

হেমলতা চুপ হয়ে যান। পদ্মজা টের পেল হেমলতা কিছু একটা লুকিয়েছেন। শুধু গ্রামের মানুষ বললেই এতো বড় দাগ লেগে যায় না কপালে। অন্য কোনো কারণ আছে। যা যুক্তি হিসেবে শক্ত ছিল। হেমলতা দম নিয়ে বলেন,’একা হয়ে যাই। তোর বাপ

সরে গেল। সমাজ সরে গেল।
আঁতুড়ঘরে একা সময় কাটাতে থাকি।
তোকে দেখলেই মনে হতো, আল্লাহ
নিজের কোনো মূল্যবান সম্পদ
আমাকে দেখে রাখতে দিয়েছেন।
আমি অন্য আমি হয়ে যাই। খোলসটা
পাল্টে যেতে থাকে। রাত জেগে স্বপ্ন
সাজাই। তোর সাথে ফুল কুড়নোর স্বপ্ন
দেখি। ফুল গাছ লাগাই। যখন তোর চার
বছর হয় বাড়ি ভরে যায় ফুলগাছে।
ছোট শাড়ি পরিয়ে প্রতিদিন মা-মেয়ে
মিলে ফুল তুলে মালা গেঁথেছি। নিশুতি
রাতে পাকা ছাদে জোছনা পোহানোর
স্বপ্ন ছিল। আজ পূরণ হলো। আর দুইটা
ইচ্ছে বাকি, সাগর জলে মা-মেয়ে পা

ডুবিয়ে পুরো একটা বিকেল কাটাব। আর, শেষ বয়সে নাতি-নাতনীদের নিয়ে তাদের মায়ের জীবনি বলব।’

পদ্মজা দু’হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হেমলতার কোমর। তিনি টের পান পদ্মজা ফোপাঁচ্ছে। উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,’পদ্ম, কাঁদছিস কেন?’

পদ্মজা বাচ্চাদের মতো কাঁদতে থাকল। কাঁদতে কাঁদতে বলল,’আমাকে কখনো একা থাকতে দিও না আম্মা। আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। তোমার মতো কেউ হয় না।’

‘এজন্য কাঁদতে হয়?আমি সবসময় তোর সাথে আছি। কান্না থামা। কী

মেয়ে হয়েছে দেখ! কেমন করে কাঁদছে। পদ্ম, চুপ...আর না...মারব এবার...পদ্ম।’

পদ্মজা থামে। কিন্তু ছটফটানি হচ্ছে ভেতরে। কেন এমন হচ্ছে জানে না। কিন্তু হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে। আকাশ ভরা রাতের দিকে তাকিয়ে ভয় হচ্ছে। একটু আগেই সুন্দর লাগছিল এই আকাশ। আচমকা ভয়ংকর মনে হচ্ছে। মায়ের কোল ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, চারিদিকে অশরীরীদের ভীর। তাদের কোলাহলে মস্তিষ্ক ফেটে যাচ্ছে। পদ্মজা মায়ের কোলে মুখ লুকালো।

‘পদ্ম,ঘুমিয়ে পড়েছিস?’

‘না আম্মা।’

‘সেদিন মাঝ রাত্রিরে ছুরি নিয়ে বের হয়েছিলাম। হানিফের ঘরটা আব্বা,আম্মার ঘর থেকে দূরে হওয়াতে সুবিধা ছিল। হানিফের ঘরের পাশে গিয়ে দেখি মদনও ঘরে। দুজনকে সামলানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাই অপেক্ষা করতে থাকি মদন কখন যাবে। এরপর আরেকজন লোক আসে। একটু দূরে সরে যাই। গোয়ালঘরের পিছনে। মিনিট কয়েক পর উঁকি দিয়ে দেখি দরজা লাগানো। সাড়াশব্দ নেই। সাবধানে দরজা ঠেলে

ঘরে ঢুকে দেখি হানিফ নেই। তখন হয়তো আম্মা দেখছে। তাই ভাবছে আমি খুন করেছি।’
‘নানু কেন এমন ভাবল? হানিফ মামা তো তোমারই ভাই।’
হেমলতা তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন না। সময় নিয়ে একটা গোপন সত্যি বললেন,’আমি তোর নানুর ভাইকে খুন করেছি। তাই তিনি আমাকে ঘৃণা করেন। ভয় পান। সন্দেহ করেন।’

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। পদ্মজা চমকে উঠে বসল। মুখখানা হা অবস্থায় স্থির হয়ে গেল হেমলতার দিকে। দৃষ্টি গেল থমকে। হেমলতা পদ্মজাকে

সামলে নিতে সময় দেন। দূরের রাতের আকাশে চোখ রাখেন। পদ্মজা নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে বলল,'তিনি কী হানিফ মামার মতো ছিলেন?'

হেমলতা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ান। সিঁড়িতে কারো পায়ের আওয়াজ। হেমলতা সাবধান হয়ে যান। পদ্মজাকে আড়াল করে দাঁড়ান। সেকেন্ড কয়েক পর একটা ছেলের দেখা মিলল। অচেনা মুখ। হেমলতা আগে কখনো দেখেননি। ছেলেটিও তাদের দেখে ভড়কে গেল।

চলবে...